ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে জাদুবাস্তবতার রূপায়ণ

কাজী সাহানা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের ছোটগল্প ও উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির এবং জাদুবাস্তবতা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য। কিন্তু 'শহীদুল জহির' ও 'জাদুবাস্তবতা' উভয়ই সমকালীন সাহিত্যে নতুন প্রসঙ্গ হওয়ায় পাঠক ও গবেষকগণ এখনো তা আয়ত্তে আনতে পারেননি। এ-কারণে শহীদুল জহিরের গল্পগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা জরুরি। শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে জাদুবাস্তবতার শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে এমন দু'টি গল্প নিয়ে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে জাদুবাস্তবতামূলক ছোটগল্পে শহীদুল জহিরের প্রবণতাকে দেখানোরও প্রয়াস রয়েছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বীকৃত কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী শহিদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮)।[১] পঞ্চান্ন বছর বয়সে অকালপ্রয়াত এই কথাশিল্পীর বাংলা কথাসাহিত্যে অভিষেক ঘটে ১৯৮৫ সালে *পারাপার* গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে; যদিও-বা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর রচনাকাল ছিলো ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে। পরবর্তীতে আর মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ—*ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯) এবং *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪), এবং চারটি উপন্যাস—*জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৭), *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৪), *মুখের দিকে দেখি* (২০০৭) এবং *আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু* (২০০৯) লিখে তিনি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে করে নেন স্থায়ি আসন। তাঁর লেখা সম্পর্কে প্রোথিতযশা কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক (জ.১৯৩৯)-এর মূল্যায়ন :

> লেখক হিসেবে জন্মেই টলমলে পায়ে হাঁটা নয়, একেবারে সেই মুহূর্ত থেকেই ঋজু মেরুদণ্ড, খাড়া ঘাড়, খরদৃষ্টি। এভাবেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শহীদুলের। না শহীদুলের নয়, তাঁর রচনার। লেখক নামে যে মানুষটি থাকে, জীবনযাপন করে, কাজে আসে, সেই মানুষ শহীদুল কোনোদিন আত্মপ্রকাশ করেননি। সঙ্গোপনে জীবনযাপন করেছেন তিনি, চলেও গেছেন প্রায় সকলের অজান্তেই। শুধু তাঁর লেখাগুলো যেভাবে নিঃসংকোচে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বাংলা সাহিত্যে বিনা আড়ম্বরে একটা শক্ত মজবুত আসন দাবি করেছিল, সেই দাবি এখন অনপেক্ষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।[২]

শহীদুল জহিরের এই 'অনপেক্ষ প্রতিষ্ঠা'র নেপথ্যে রয়েছে তাঁর নিজস্ব ভাবনা, শব্দ-চয়ন, আবহ-নির্মাণ এবং এক নতুন শিল্পকৌশল—যা 'জাদুবাস্তবতা' নামে পরিচিত। ষাটের দশকে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জ.১৯৩৯) প্রমুখের লেখায় হয়তো এর নিরীক্ষা ছিলো, কিন্তু বাংলাদেশের কথাশিল্পে জাদুবাস্তবতার ধারণাটি পরিণতি ও প্রতিষ্ঠা পায় নব্বইয়ের দশকে শহীদুল জহিরের লেখনির মধ্য দিয়ে।

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

জাদু ও বাস্তবতার সম্মিলন সাধারণঅর্থে 'জাদুবাস্তবতা'; যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ম্যাজিক রিয়ালিজম্'। এই আখ্যাটি সম্ভবত জার্মান *Magischer Realismsu* থেকে এসেছে, তারপর এটি ডাচ্ ভাষায় অনূদিত হয় *Magisch-realisme*, এই পথ বেয়ে স্পেনীয় *realismo magico* এবং ইংরেজি '*magic realism*' ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে। জার্মান *Magischer Realismsu* আখ্যাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে জার্মান ভাইমার রিপাবলিকের চিত্রকলা সূত্রে; যে চিত্রে বাস্তবের অন্তরালে জীবনরহস্যকে ধরার প্রয়াস ছিলো।[৩] ১৯২৫ সালে জার্মানের মিউনখ শহরে পোস্ট-এক্সপ্রেশনিস্ট্ বা উত্তর-অভিব্যক্তিবাদীদের সেই প্রদর্শনীর শিল্পসমালোচনায় জার্মান শিল্পসমালোচক ফ্রাঞ্জ রোহ্ (১৮৯০-১৯৬৫) প্রথম জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্য এবং পরাবাস্তববাদের সঙ্গে জাদুবাস্তবতাবাদের সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে ধরেন। অল্প সময়ের মধ্যে জাদুবাস্তবতাবাদ চিত্রশিল্পে পরিচিত হয়ে উঠলেও পরাবাস্তবতাবাদের গ্রাসে তা বেশি দিন স্থায়ি হয়নি। চিত্রশিল্পে জন্ম নেয়া জাদুবাস্তবতা স্থায়ি হলো কথাসাহিত্যে। আর্জেন্টাইন কথাশিল্পী হোর্স লুই বোর্হেস (১৮৯৯-১৯৮৮) এবং কিউবার ঔপন্যাসিক আলেহো কর্পেন্তিয়া (১৯০৪-১৯৮০)-এর উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার নতুন যাত্রা সূচিত হলেও এর সর্বাত্মক মুক্তি ও প্রতিষ্ঠা মিললো কলাম্বিয়ান কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়ার গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪)-এর রচনায়।[৪] আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রবণতা, বিশেষ লোকসাহিত্যের ব্যবহার, অদ্ভুতত্ব ও আতঙ্ক-রস, আর সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* (১৯৬৭) উপন্যাসটি এক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে স্মর্তব্য। এরপর জাদুবাস্তবতা-রীতিতে লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে ইসাবেল আইয়েন্দের *ভূতেদের বড়ি* (১৯৮২), অ্যাঞ্জেলা কার্টারের *বিজ্ঞ ছেলেমেয়েরা* (১৯৯১), এ্যান্ড্রি ব্রিস্কের *শয়তানের উপত্যকা* (১৯৯৯) অন্যতম। বাংলাদেশের কথাশিল্পে এ-রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন শহীদুল জহিরের *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প*।

পূর্বে বলা হয়েছে, জাদু ও বাস্তবতার সম্মিলন সাধারণঅর্থে 'জাদুবাস্তবতা'। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, 'জাদু' আর 'বাস্তব' পরস্পর বিপরীতধর্মী উপাদান। এ-কারণে জাদুবাস্তবতার ধারণাটি অনেকটা জটিল। *The Oxford Companion to English Literature (2007)* অনুযায়ী জাদুবাস্তবতার সংজ্ঞা হলো :

> Magic realist novels and stories have, typically, a strong narrative drive, in which the recognizably realistic mingles with the unexpected and the inexplicable, and in which elements of dream, fairy story, or mythology combine with the everyday, often in a mosaic or kaleidoscopic pattern of refraction and recurrence.

জে.এ. কডডন তাঁর *Dictionary of Literary terms and Literary Theory (1999)* গ্রন্থে জাদুবাস্তবতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করেছেন, তা হলো[৫] :

১. the mingling and juxtaposition of the realistic and the fantastic or bizarre; অর্থাৎ বাস্তব-অবাস্তব ও উদ্ভটত্বের সম্মিলন।
২. skilful time shifts; অর্থাৎ সময়কে ভেঙ্গেচুড়ে অতীত-বর্তমানকে একাকার করার দক্ষতা।
৩. convoluted and even labyrinthine narratives and plots; অর্থাৎ জটিল, প্যাঁচানো এবং গোলকধাঁধাপূর্ণ কাহিনি।
৪. miscellaneous use of dreams, myths and fairy stories; অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার স্বপ্ন-কল্পনা, পুরাণ এবং রূপকথার সম্মিলন।
৫. expressionistic and even surrealistic description; অর্থাৎ আবেগনির্ভর অভিজ্ঞতার প্রতীকী প্রকাশ বা অভিব্যক্তিবাদী ও পরাবাস্তব বর্ণনা।

৬. arcane erudition; অর্থাৎ প্রবল রহস্যময় অধিবিদ্য।

৭. the element of surprise or abrupt shock; অর্থাৎ বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত অভিঘাত।

৮. the horrific and the inexplicable; অর্থাৎ লোমহর্ষক ও ব্যাখ্যাহীনতা।

আবার, জন মিলিন্ তাঁর *Magic Realism* গ্রন্থে জাদুবাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন[৬] :

১. এখানে থাকবে ফ্যান্টাসি ও অশিল্পিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, সমাজবাস্তবের সমন্বয়, উদ্দেশ্য সেই সত্যসন্ধান যা প্রাত্যহিকতার আড়ালে থাকে।

২. লেখক প্রকৃতিতে, মানব আচরণে সন্ধান করে চলেন এক লুকোনো ক্ষমতা/শক্তি, বাস্তব এখানে ভাঙা, আর এই রদবদলের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে পৌঁছে যান পাঠক।

৩. জাদুবাস্তববাদী রচনায় চাবি-ঘটনার কেন্দ্রীয় কোনো কার্যকারণগত মনস্তত্ত্বগত ব্যাখ্যা থাকে না।

৪. জাদুবাস্তববাদী পরিপার্শ্বের বাস্তবকে অনুসরণ না করে তার আড়াল থেকে বেরুতে থাকা রহস্যকে ধরতে চায়।

উপর্যুক্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে বলা যায়, জাদুবাস্তবতা হলো বাস্তব-অবাস্তব-অতিবাস্তব-পরাবাস্তব, লৌকিক-অলৌকিক-অতিলৌকিক, স্বপ্ন-কল্পনা-ভ্রম, লোকবিশ্বাস-লোকশ্রুতি-রূপকথা-পুরাণ, আকস্মিকতা-ব্যাখ্যাহীনতা-উদ্ভটতা-লোমহর্ষকতা ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি অভিনব ও চমকপ্রদ শিল্প-প্রয়াস।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহিরের সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠার মূল কারণ হলো জাদুবাস্তবতা। এই জাদুবাস্তবতা তিনি প্রথম সফলভাবে প্রয়োগ করেন ছোটগল্পে; ১৯৯২ সালে প্রকাশিত *কাঠুরে ও দাঁড়কাক* এবং *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্প দুটির মাধ্যমে। পরবর্তীতে তিনি জাদুবাস্তবতাযুক্ত *চতুর্থ মাত্রা*, *ইন্দুর-বিলাই খেলা*, *ডুলু নদীর হাওয়া* ইত্যাদি ছোটগল্প লিখলেও শিল্পনিপুণতায় ও পাঠকের হৃদয়গ্রাহ্যতায় বিরানব্বইয়ের গল্প দুটিই অধিক প্রশংসিত। বস্তুত, এই গল্প দুটির মধ্য দিয়েই জাদুবাস্তবতা সম্পর্কে জানা যায় এবং সেইসঙ্গে শহীদুল জহিরের অভিনবত্ব বোঝা যায়। তাই এ-গবেষণাপ্রবন্ধে *কাঠুরে ও দাঁড়কাক* এবং *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্প দুটি সামনে রেখে শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে জাদুবাস্তবতার রূপায়ণকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই গবেষকের প্রয়াস।

কাঠুরে ও দাঁড়কাক

কাঠুরে ও দাঁড়কাক ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রকাশমাধ্যম : ছোটকাগজ *রূপম*; সম্পাদক : আন্ওয়ার আহমদ।[৭] গল্পটির কাহিনি হলো : বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কাঠুরে আকালু অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'কাকের ডাক' জনিত লোকসংস্কারে স্ত্রী টেপির জেদাজেদিতে পাঙ্গাসি হাইস্কুলের এক পাশে জন্মানো একশো বছরের পুরোনো বটগাছের গিঁট ও কন্দ কাটতে যায়। তিন দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে সাতটি টুকরো কাটার পর তার কুড়ালের ফলা ছোট ও গোলাকার হয়ে আসা গিঁটটার ভেতরে ঢুকে যায় এবং সে সেখানে গুপ্তধন আবিষ্কার করে : 'একশ ট্যাহার নোট এইগুলান, এক বান্ডিলে আছে একশ খান, আর বান্ডিল হইলো দশখান।' এতোগুলো টাকা পাওয়ার তার দুশ্চিন্তা হয়। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সে সিরাজগঞ্জে যায় কোনো 'উহিলটুহিলের' কাছে 'বুদ্ধি' নিতে। উকিল ও উকিলের সন্ধানদাতা সিগারেটবিক্রেতার সঙ্গে তার চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্ত টাকার অর্ধেক পাঁচ বান্ডিল

উকিল, বাকি পাঁচ বান্ডিলের মধ্যে তিন বান্ডিল পানবিক্রেতা, আর অবশিষ্ট দুই বান্ডিল কাঠুরে-দম্পতি পায়। উকিল তাকে বুদ্ধি দেয়, এই টাকা যেন এক বছর সে লুকিয়ে রাখে এবং পরবর্তীতে 'অল্প অল্প কইরা বাইর' করে। কিন্তু সে-রাতেই মুখে গামছা বাঁধা পাঁচজন লোক এসে তাদেরকে আমগাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখে মেঝে খুঁড়ে টাকাগুলো নিয়ে যায়। 'পুলিশ আইসলে ট্যাহার কথা জাইনা যাইবনি; আর অমনি জেলে'—পুনরায় এমন আশঙ্কা করে ওরা গোপনে যমুনা পার হয়ে ভূঞাপুর থেকে বাসে চেপে বেলা তিনটায় ঢাকার গুলিস্তানে এসে নামে। সে-সময় দয়াগঞ্জের রিকশাওয়ালা চান্দু বাস থেকে আকালু নামতেই চমকে যায় এবং আকালুকে চান্দুর হারিয়ে যাওয়া দোস্ত 'জয়নাল' বলে সন্দেহাতীতভাবে মনে হয়। আকালু তার ভুল ভাঙ্গাতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। অনেক চাপাচাপির পর টেপির কথায় আকালু-দম্পতি চান্দু-দম্পতির সঙ্গে দয়াগঞ্জ বস্তিতে বসবাস শুরু করে। চান্দু আকালুকে ধূপখোলার মাঠে নিয়ে গিয়ে রিকশা চালানো শেখায় এবং দয়াগঞ্জের এক মহাজনের কাছ থেকে একটি রিকশা যোগাড় করে দেয়। একদিন এক যাত্রি আকালুকে রিকশাভাড়া না দিয়ে গুলিস্তানগামী একটি চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠার সময় তার পকেট থেকে মানিব্যাগটি ছিটকে নিচে পড়ে গেলে আকালু তা দ্রুত কুড়িয়ে নেয়। মানিব্যাগে সে একাত্তর টাকা পায়; কিন্তু গাছের ফোকরে পাওয়া টাকার কথা মনে পড়ায় সে ভয় পেয়ে টাকাগুলো পুলিশকে দিতে পুলিশফাঁড়ি যায়। তিনজন পুলিশ তাকে চোর সনাক্ত করে প্রথমে আকালুর পাছায়, উড়ুতে এবং কাঁধে আধ মিনিট ধরে একটি মোটা গাঁটওয়ালা লাঠি দিয়ে পেটায় এবং পরবর্তীতে আকালুর লুঙ্গির খুঁট থেকে তার উপার্জিত ছয় টাকাও নিয়ে নেয়। উপরন্তু টাকা তিন ভাগ করার সুবিধার্থে আকালুকে আরো তেরো টাকা দুপুরের আগে এনে দিতে বলে পুলিশেরা তার রিকশা নম্বর লিখে রেখে তাকে ছেড়ে দেয়। বারবার এমন বিপর্যয়ে দাঁড়কাকের আছড় আছে মনে করে আকালু নাজিরাবাজারের গলির ভেতর জ্যোতিষবাবার শরণাপন্ন হলে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে জ্যোতিষ তাকে একটা নীলা পাথর দেয়। নীলা পাথর ব্যবহারে দুদিন তার আর্থিক উন্নতিও হয়। কিন্তু তার পরদিন বস্তিতে পুলিশ এসে জ্যোতিষ ভাস্করের রত্নরাজি চুরি করার অভিযোগে আকালুকে ধরে নিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে আকালু চুরির অভিযোগ মেনে নেয় এবং এই চুরির বুদ্ধি তার স্ত্রী টেপি দিয়েছে বলে জানালে পুলিশ টেপিকেও ধরে আনে এবং এতে করে আদালত তাদের দেড় বছরের জেল দেয়। জেলখানায় একদিন দাঁড়কাকে ফেলে যাওয়া একটি সোনার আংটি আকালু পুনরায় পেলে সে তা ছিঁচকে চোর আবুল হোসেনকে দেয়। আবুল হোসেন তা স্ত্রীর মাধ্যমে পাচার করতে গেলে ধরা পড়ে। এতে জেলারের নিকট আকালুকে জবাবদিহি করতে হয়। জেলারকে আংটিটি দিয়ে আকালু সে-যাত্রায় মুক্তি পায়। চার মাস পর আকালু ও টেপি মুক্তি পেলে জেলার তাদেরকে মগবাজারের পূর্বপ্রান্তে নয়াটোলায় চারদিন বিস্তৃত খালি জায়গার মাঝখানে দেয়াল ঘেরা একটি প্রাঙ্গনে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আকালু কামলা খাটার, আর টেপি শাহনূরীর মাজারের কাছে এক বাসায় ছুটা ঝিয়ের কাজ নেয়। এভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পর একদিন ওরা পুনরায় 'কাউয়া' আসায় বিস্ময় ও আতঙ্কিত হয় এবং বহুদিন পর তাদের ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে বড় বড় বোরাক বাঁশ কিনে এনে ক্রমাগত বাড়তে থাকা দাঁড়কাকদের জন্য একান্নটি লাইনে সর্বমোট ছয়শো তেষট্টিটি আড়া বেঁধে দেয়। তারা কাকের চাষ শুরু করে। এলাকাবাসি প্রথমে ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিলেও আকালু যখন কাকের বাসা ভেঙে সাড়ে আঠারো মণ সাইকেলের স্পোক, লোহার তার, ইস্পাতখন্ড বিক্রি করে, তখন মহল্লার লোকেরা বিষয়টির প্রতি সচেতন হয়। আরো পরে, এলাকার রাস্তার ঝাড়ুদারণী নিমফল দাসীকে একদিন বাসার ভেতর ডেকে এনে টেপি তাকে কাকের ডিমভাজি খাওয়ায় এবং বিদায়কালে কাকের বাসা থেকে পাওয়া একজোড়া সোনার দুল দেয়। এতে এলাকার অনেক লোক কবুতর পোষা বাদ দিয়ে কাকের আবাদ করতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু ক্রমাগত ছয় মাস চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তারা এক পর্যায়ে আকালুর কাছে সোনার দুল দাবি করে। আকালু তা পাওয়ার শর্তে রাজি হয়। কিন্তু ছয় মাসেও তারা সোনার দুল পায় না, আকালু ও তার স্ত্রীকেও কোথাও দেখতে

পায় না; কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে কাকের ডিমভাজার গন্ধ পায় এবং ভরা দিনের বেলায়ও আড়া ভর্তি কাক দেখতে পায়। অস্বস্তিতে থাকা তিনজন লোক দেয়াল টপকালে দশটি কাক তাদের ঠোকর মারে। এতে সোনাদানা না পাওয়া খ্যাপা লোকদের ক্রোধ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারা আকালু ও টেপিকে বাহিরে বের করতে প্রাচীরের বাহিরে দিনরাত পাহারা দেয়। এই অবরোধের ত্রিশতম দিনের দিবাবসানের রাত্রি একটু গভীর হয়ে এলে মহল্লাবাসি আকালুর বাসায় আগুন লাগিয়ে দেয়। পাহারারতদের মতে, আগুনের ধোঁয়ায় 'হাজার হাজার লাখ লাখ' কাক উড়ে যায়। তখন লোকেরা এক হাতে লাঠি, বল্লম, লোহার রড এবং অন্য হাতে একটি করে চটের ছালা নিয়ে প্রাচীরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে যে, ভেতরে মানুষের কোনো চিহ্ন নেই; তবে চুলার ওপর একটি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে রয়েছে কাকের নয়টি নীল রঙের সেদ্ধ ডিম। পানির ভেতর হাতের মুঠোয় কাকের সেদ্ধ ডিম নিয়ে তারা নিশ্চিতরূপেই একটি হালকা উষ্ণতা অনুভব করে। অবরোধ ভেঙে আকালু এবং টেপির অন্তর্ধানের বিষয়ে নয়াটোলার লোকদের বিভ্রান্তি আরও প্রবল হয়ে ওঠে যখন মহল্লায় এই কাহিনি প্রচারিত হয় যে, আসলে ওই কাকেরা তাদের বাঁশের আড়া ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকালু এবং টেপিকে ঠোঁটে করে নিয়ে যায়। কেননা, এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষি রামপুরা ঝিলের কিনারায় নৌকা বেঁধে পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা লোকগুলো।

কাঠুরে ও দাঁড়কাক গল্পটির কাহিনি দীর্ঘ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক। আর, এই পুনরাবৃত্তির কারণেই গল্পে সৃষ্টি হয়েছে বিস্ময় ও উদ্ভট রস এবং পাঠকের মনে দানা বেঁধেছে অবিশ্বাস। গল্পে একটি দাঁড়কাক একটি দম্পতির সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণের নিয়ন্ত্রণ করেছে, যা লোকসংস্কার ও রূপকথাতেই ঘটে। গাছের ফোকর থেকে গুপ্তধন প্রাপ্তির বিষয়টিও রূপকথা বা লোককথা-নির্ভর। গল্পের শেষে আকালু ও টেপির অন্তর্ধান হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতঅর্থেই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। আকালু ও টেপির শেষ আশ্রয়-স্থল কোথায়, তা শেষপর্যন্ত ব্যাখ্যাহীনেই থেকে গেছে। ভূমিহীন গবির শ্রমজীবী আকুল ও টেপি-দম্পতি কি সত্যিই সৎ, তারা কি লোভ ও চতুরতার ঊর্ধ্বে ছিলো—এমন সহজ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়; বরং জটিলই। সব মিলে কাঠুরে-দম্পতি ও দাঁড়কাক পাঠকের কাছে রহস্যপূর্ণই থেকে যায়।—এসব গল্পটির 'জাদুময়' একদিক। আর, গল্পটির 'বাস্তবময়' অন্যদিক হলো, আকালু ও টেপিরা আজীবন চতুর, সুযোগসন্ধানী ও উচ্চশ্রেণির মানুষদের নিকট প্রতারিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়। তাদের বিপদে খেটে খাওয়া চান্দুরাই 'দোস্ত' বলে এগিয়ে আসে; যদিও-বা শেষ পর্যন্ত নিজের বিপদের ভয়ে সহযোগিতা চালিয়ে যেতে পারে না, ব্যর্থ হয়। আকালু-টেপি-চান্দুদের ভবিষ্যৎ সব সময়ই অনিশ্চিত। দেশে চলমান পুলিশি নির্যাতন, পুলিশদের অবৈধ ভাগবাটোয়ারা, পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ভয় ও আশঙ্কা ইত্যাদি সমাজ-বাস্তবতারই অংশ। অর্থাৎ, জাদুর সঙ্গে বাস্তবতার যুগল মিলন ঘটেছে *কাঠুরে ও দাঁড়কাক* গল্পে। গল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়নে গবেষক আজহার ইসলাম উল্লেখ করেছেন :

> গল্পের বিষয়টি যেন জাতকের গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; নামকরণটিও জাতকের মতো। এতে দাঁড়কাককে ভর করে মানুষের জীবনে আশাবাদ ও অভিশাপের যুগপৎ লীলার অভিব্যক্তি ঘটেছে। আকালু ও টেপির সংসার-জীবনের দিকগুলো যেন ভালোবাসার স্পর্শকাতর নিগড়ে বাঁধা।[৮]

অন্যদিকে, *কাঠুরে ও দাঁড়কাক* গল্প সম্পর্কে গবেষক মেহেদী ধ্রুবর সার্বিক মূল্যায়ন হলো :

> *কাঠুরে ও দাঁড়কাক* গল্পটি সমকালীন দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে; যেখানে মানুষের প্রবৃত্তিতাড়িত লোভ-লালসা, অবচেতন মনের মধ্যে জেগে থাকা স্বার্থপর প্রবৃত্তির সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলন, বিপ্লব, গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক হত্যাকা[৯], ঘেরাও, অবরোধের ইঙ্গিত, রূপকথা, লোকশ্রুতি, জাদুবাস্তবতা এবং পরাবাস্তবের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকটিত হয়েছে; এবং গল্পকার নিকৃষ্ট

> কাকের মধ্যেও ইতিবাচক মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আবহমান বাঙালির লোকসংস্কার-লোকশ্রুতিতে যে দাঁড়কাক অমঙ্গলের বার্তাবাহক এই গল্পে সে কাক আকালু ও টেপির মঙ্গলবাহক; এখানেই গল্পকারের স্বাতন্ত্র্য কিংবা সার্থকতা।[৯]

কাঠুরে ও দাঁড়কাক গল্পে রূপক হলো জাদুবাস্তবতার একটি উজ্জ্বলতম উপাদান। গল্পটির শিল্পসার্থকতা নির্ধারণে রূপকের ব্যবহার অসাধারণ। গল্পটির রূপকতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয় কয়েকটি উদ্ধৃতি :

১. ঢাকা শহরের প্রবীণ অধিবাসীরা স্মরণ করতে পারে যে, বহুদিন পূর্বে ঢাকা শহর একবার কাকশূন্য হয়ে পড়ে, তখন এই ঘটনা অথবা ঘটনাবলি পাঁচ বৎসর ধরে সংঘটিত হয় এবং এর সূচনা হয় বৈকুণ্ঠপুর নামক এক গ্রামে।[১০]

২. সে তখন দ্রুত ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে গেঞ্জির নিচে লুকিয়ে ফেলে, তারপর সে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ব্যাগটা বের করে টাকা গুনে দেখে, একাত্তর টাকা আছে ব্যাগে।[১১]

৩. হুম, ডিউটি অফিসার বলে, সাতাত্তর টাকা তো ভাগ করাই মুশকিল, শালার নব্বইটা টাকা হইলে সুবিধা হইত।...কিন্তু তোমাক শালা ছাড়ব না, দুপুরের আগে আরো তেরো টাকা আইনা দিয়া যাবি, না দিলে শালা তোমাক ধইরা ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু।[১২]

৪. এবং অবরোধের ত্রিশতম দিনের দিবাবসানের পর রাত্রি একটু গভীর হয়ে এলে আকালুর বাসার চারদিকে শুকনো ঘাষ-পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।[১৩]

৫. এই ঘটনার পর ঢাকা কাকশূন্য হয়ে পড়ে এবং ঢাকার প্রবীণ লোকেরা এখন মনে করতে পারে যে, সেইসব দিনে কলতলা থেকে সাবান হারানোর ঘটনা একেবারে বন্ধ হয়ে আসে; কিন্তু একই সঙ্গে রাস্তার অপরিষ্কৃত আবর্জনার স্তূপ জমে যেতে থাকে এবং শহরের আকাশ পাখিহীন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এভাবে বহুদিন কেটে যায়, তারপর আশপাশের মফস্বল থেকে কিছু কাক আসে এই শহরে এবং মফস্বলের এই কাকেরা নূতন প্রজন্মের কাকের জন্ম দিয়ে শহরের আকাশ পুনরায় ভরে তোলে।[১৪]

উপর্যুক্ত প্রথম উদ্ধৃতিতে 'পাঁচ বছর', দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'একাত্তর', তৃতীয় উদ্ধৃতিতে 'নব্বই', চতুর্থ উদ্ধৃতিতে 'অবরোধ' এবং পঞ্চম উদ্ধৃতিতে 'সাবান', 'আবর্জনার স্তূপ', 'একঘেয়ে' ও 'নূতন প্রজন্ম' ইত্যাদি বিশিষ্টার্থক সংখ্যা ও শব্দগুলো এসেছে; যা দ্বারা বস্তুত বাংলাদেশের একটি বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস ইঙ্গিতময় হয়েছে। গল্পটি সম্পন্ন হয়েছে পাঁচ বছরে; অর্থাৎ, ছেয়াশির নির্বাচন থেকে একানব্বইয়ের নির্বাচন পর্যন্ত সময়কাল পাঁচ বছর। গল্পটি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেছে একটি দাঁড়কাক; অর্থাৎ সে-সময় দেশের সামগ্রিক নির্দেশনা দিয়েছে একজন একনায়ক-স্বৈরশাসক। গল্পে আকালুর প্রাপ্তি 'একাত্তর টাকা' হলো বাংলাদেশের অর্জিত স্বাধীনতা। আর একাত্তর টাকার সঙ্গে অতীতের সঞ্চয় ছয় টাকা যোগ হয়ে সাতাত্তর টাকা হলে তাতে তিন পুলিশের মন ভরে না; ওরা আরো তেরো টাকা যোগ করে নব্বই টাকা দাবি করে। এখানে 'তিন পুলিশ' হলো একনায়ক-স্বৈরশাসন চলাকালীন সরকারের তিন বিভাগ : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ; আর 'নব্বই টাকা' হলো নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান। একনায়ক-স্বৈরশাসকগোষ্ঠি জাতির অর্জন একাত্তরের চেতনাকে গ্রাস করেই যে বিরত থাকেনি, তারা যে নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনকেও গ্রাস করতে চেয়েছিলো, তা এখানে অনুমান করা যায়। এরপর আসে মহল্লাবাসি দ্বারা অবরোধের প্রসঙ্গ; যা আশাভঙ্গ হওয়া উত্তেজিত দেশবাসি কর্তৃক একনায়ক-স্বৈরশাসক এরশাদ-সরকারকে অবরোধ করে রাখার রাজনৈতিক কর্মকা[৯]। এরপর ঢাকা শহর কাকশূন্য; অর্থাৎ একনায়ক-স্বৈরশাসক এরশাদ-সরকারের পতন ও গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা। গল্পের শেষ-পর্যায়ে বর্ণিত 'সাবান' হলো মেধাবিকাশক

সুগন্ধী, যা গণতন্ত্রের সুফল; আর, 'আবর্জনার স্তূপ' হলো গণতন্ত্রের বাঁধা বা সীমাবদ্ধতা। 'পাখিহীন একঘেয়ে' হলো আন্দোলনহীন পরিবেশে কিছু সংখ্যক মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং 'নূতন প্রজন্ম' হলো দাঁড়কাকরূপী নব্য-শাসকদের বিকাশ। শহর-নগর-বন্দর কখনো স্থায়িভাবে দাঁড়কাক থেকে মুক্ত হয় না। দাঁড়কাকরা কোনো-না কোনোভাবে আকালু-টেপিদের ওপর ভর করে; কিন্তু তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায় না। এভাবে প্রতীক-রূপকের আশ্রয়ে *কাঠুরে* ও *দাঁড়কাক* গল্প একটি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালীন প্রেক্ষাপটকে নির্দেশ করে।

ডুমুরখেকো মানুষ

ডুমুরখেকো মানুষ ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে। প্রকাশমাধ্যম : ছোটকাগজ *প্রাকৃতক*; সম্পাদক : হাসান আজিজুল হক।[১৫] গল্পটির কাহিনি হলো : ভিক্টোরিয়া পার্কের বিকালের আলোয় একজন জাদুকর জাদু দেখায়। ছয় ইঞ্চি লম্বা ও ঈষৎ বাঁক-খাওয়া হাড় দেখিয়ে সে উপস্থিত মানুষগুলোকে বলে, 'এইটা কুনো হাড্ডি না, এইটা একজন মায়ালোক, একজন মহিলা, ওর নাম প্রতীলতা...এইটা আমার প্রেমিকা, আমার স্ত্রী, আপনেরা যদি ধৈর্য ধইরা খাড়ান তাইলে ব্যাকতের শ্যাষে এই প্রীতিলতারে আপনেরা দেখতে পাইবেন; সে খুব সুন্দরী মায়ালোক, হাচা কই।'[১৬] এরপর অনেক ভূমিকা শেষে জানা যায়, মোহাব্বত আলি জাদুগির আসলে একজন ফলবিক্রেতা এবং এই ফলটির নাম 'ডুমুর'। ফরাশগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ঘেঁষে তার প্রাসাদের পিছন দিকে যোজনবিস্তৃত এক বাগিচায় এই ফল হয় এবং মোহাব্বত আলি জাদুগির, প্রীতিলতা ও আব্দুল শুধুমাত্র এই খেয়ে বেঁচে থাকে; আর কাপড়চোপড় ও কেরোসিন কেনার জন্য বাড়তি ফল বিক্রি করে। তার ফলবিক্রির শর্ত হচ্ছে, সে উপস্থিত সবাইকে একটি করে ডুমুর বিনে পয়সায় খেতে দিবে এবং কেউ যদি পুনরায় খেতে চায়, তাহলে তাকে হাফ ডজন ডুমুর দুই টাকা দিয়ে কিনতে হবে। পরবর্তীতে আরো খেতে চাইলে জ্যামিতিক হারে দাম বৃদ্ধি পাবে। আর, এজন্য একবার কেউ তার কাছে ডুমুর কিনলে সে আজীবন ক্রেতার নাম মনে রাখে। এক্ষেত্রে তার পরামর্শ হলো, ক্রেতাদের উচিত আস্তে আস্তে এই ফল খাওয়া, যেন কিছু ডুমুর জীবনের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এভাবে সে বিভিন্ন জায়গা জাদুখেলা দেখানো সঙ্গে সঙ্গে ডুমরফল বিক্রি করে। কিন্তু একসময় পুরনো ডুমুরখেকো-ক্রেতা আব্দুল গফুর, আব্দুল জলিল, শরফুল আলম, শহীদুল হক ও ইদ্রিস আলিরা উচ্চ মূল্যের জন্য আর ডুমুর কিনতে পারে না। তারা জাদুকরের ক্রিয়াকলাপ চুপচাপ অবলোকন করে; আর, বসে বসে জাদুকরের ডুমুর বিক্রি দেখে। একদিন তারা মোহাব্বত আলিকে ঘিরে ধরে ডুমুরের গাছ কিনতে আগ্রহী হয় এবং প্রতিটি গাছের জন্য তার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত বলে জানায়। কিন্তু জাদুকর হাসে এবং মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায়। এই পাঁচজন ডুমুরখেকোর পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত দেখা হতে থাকে। তারা জাদুকরকে ডুমুর গাছ বিক্রিতে সম্মত করতে ব্যর্থ হয়ে একদিন জাদুকরের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এক শনিবার সকালে তারা পাঁচজন শ্যামবাজার পার হয়ে দক্ষিণ দিকে সোনালি রঙের গম্বুজওয়ালা এক অতিকায় অট্টালিকায় প্রবেশ করে এবং জাদুকরের নিকট ডুমুর গাছ কিতে চায়। জাদুকর জানায়, ডুমুর গাছ বিক্রি হয় না, তাদের ফিরে যেতে হবে। তারা পুনরায় তাদেরকে একটি করে ডুমুর গাছ দেয়ার অনুরোধ করে। 'তারা বলে যে, তারা কম ডুমুর খেয়ে বাঁচতে পারে না এবং ডুমুর কিনতে এখন এত পয়সা লাগে যে, কেবল কঠোর পরিশ্রম করে তারা তা সংগ্রহ করতে পারে; এবং এত পরিশ্রম তারা আর সহ্য করতে পারে না; তাই তারা বলে, আমাদের একটা কইরা গাছ দিয়া দেন, আমরা আপনেরে পয়সা দিমু।'[১৭] এতে জাদুকর খুব বিরক্ত হয় এবং ক্ষেপে ওঠে ওদেরকে প্রাসাদ ত্যাগ করতে বলে। জাদুকরের ক্রোধান্বিত চেহারা দেখে অনুপ্রবেশকারী ডুমুরখেকোরা ভয় পেয়ে ছুটে বাইরের ঘরে বের হয়ে আসে। সেখানে আলমারিতে পাওয়া কাটারি, বর্শা ও লোহার রড

তুলে নিয়ে তারা পুনরায় জাদুকরের ঘরে প্রবেশ করে এবং কাটারি ও বর্শার ঘায়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা জাদুকরের মস্তক করোটি চূর্ণ ও দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে। জাদুকরের মৃতদেহ বিছানার ওপর রেখে তারা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে পিছনে ডুমুর বাগিচার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেখানে মৃদু ও নিশ্চিত শব্দ হলে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যে, মৃদু চির-চির শব্দ করে একটি ডিমের খোসার মতো ইমারতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এতে তারা বাইরে বের হওয়ার জন্য উল্টো দিকে দৌড়ায় এবং একসময় তারা নিজেদের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পানির কিনারায় এক কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় আবিষ্কার করে। এতোক্ষণের ঘটনাগুলোকে তারা স্বপ্ন মনে করলেও নিজেদের হাতে লোহার রড ও খঞ্জর এবং গায়ের জামায় রঞ্জিত রক্ত দেখে 'প্রবল আতঙ্কের ভেতর একপ্রকার অবসাদ' অনুভব করে, তাদের চোখ-মুখ গরম হয়ে ওঠে, শরীরে কাঁপুনি আসে। বাড়ি ফিরলে পাঁচটি গৃহের লোকেরা তাদেরকে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে দেয় এবং প্রবল তাপ ও শারীরিক বিক্ষেপের কারণে তাদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর কত মিনিট বা ঘণ্টা পার গৃহের লোকেরা আর ডুমুরখেকোদের খুঁজে পায় না; তারা প্রত্যেক চাদরের নিচে বিছানার ওপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড করে হাড় পড়ে থাকতে দেখে। গল্পের শেষ লাইনটি হলো, 'এখন এইসব মহল্লার লোকেরা ডুমুর ভক্ষণকারী এইসব লোকের কথা বলে, তারা তাদের ডুমুর খাওয়ার আনন্দ এবং বেদনার কথা বলে এবং তারা তাদের অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে।'[১৮]

ডুমুরখেকো মানুষ গল্পের কাহিনি একমুখী। *কাঠুরে* ও *দাঁড়কাক* গল্পের মতো এর কাহিনি পুনরাবৃত্তিমূলক নয়। গল্পকার এ-গল্পে চেতনাপ্রবাহ রীতিতে কোনো রকম বিরতি না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে গল্প বলে গেছেন। একজন জাদুকরকে নিয়ে গল্প হওয়ায় এ-গল্পে স্বাভাবিকভাবেই ভয়, আতঙ্ক, বিস্ময়, রহস্য, কৌতুক, ধাঁধা, লোককথা, রূপকথা, সংস্কার ও ব্যাখ্যাহীনতা এসেছে। আবার, গল্পে অনেকগুলো ঘটনা বা প্রসঙ্গ উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত ও লোমহর্ষক বলে মনে হয়েছে; যেমন : ডুমুরখেকো-ক্রেতাদের নাম আজীবন মনে রাখা, ডুমুরের দাম প্রতি বারে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া, জাদুকরের হত্যা হওয়া, জাদুকরের প্রাসাদ দ্বিখণ্ডিত ও অদৃশ্য হওয়া, হত্যাকারী ডুমুরখেকোদের ধূসর বর্ণের হাড়ে পরিণত হওয়া ইত্যাদি। অন্যদিকে, একজন জাদুকরের খেলা দেখানোর কৌশল ও জীবন-জীবিকা, সুস্বাদু ফল খাওয়ার প্রতি মানুষের চিরন্তন আগ্রহ ও লোভ এবং লোভ ও ধৈর্যচ্যুতিতে অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাওয়ার বাস্তবসম্মত বিষয়গুলোও সুচারুভাবে এসেছে। অর্থাৎ, সংজ্ঞার দিক থেকে গল্পটি জাদুবাস্তবতার শর্ত পূরণ করেছে। গল্পটি সম্পর্কে আলোচক মামুন মুস্তাফা বলেন :

> *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্পটি পুরোমাত্রায় পরাবাস্তব একটি গল্প। গল্পটির শুরু থেকে শেষাবধি যে চমক লেখক দেখিয়েছেন, সেখানে অস্তিত্ববাদ, ম্যাজিক রিয়্যালিজম কিংবা পোস্টমর্ডানিজমের প্রতিভাস পাওয়া সম্ভব। শহীদুল জহিরের এই গল্পটি সময়ে ধৃত বাস্তবতাকে স্বীকার করেই পাষাণের মত সময় নিরপেক্ষতার দিকে ধাবমান। মোহাম্মদ আলি জাদুকর এবং তার দুই সঙ্গী প্রীতিলতা ও আব্দুলের অস্থি-কংকাল সময়ের অস্থির ধ্বস্ত প্রবাহের সঙ্গী হয়ে নিজস্ব ভূগোলের চৌহদ্দিতেই নয় বরং এক ধরনের কোলাজশৈলীর বুননে তার সঙ্গে একীভূত হয়েছে ইতিহাসয়ন, সময়ে পূর্বাপর প্রেক্ষিত এবং চেতনাস্রোত। আর চেতনাস্রোতের পরতে পরতে স্থান করে নিয়েছে লেখকের কলমের জাদুবাস্তবতা, যা কিনা মনোজগতের পরাবাস্তব অধিবিদ্যা।[১৯]

ডুমুরখেকো মানুষ গল্পের জাদুবাস্তবতায় অনেকগুলো উপাদানের সঙ্গে 'মনোজগতের পরাবাস্তব অধিবিদ্যা'-ও এসেছে; কিন্তু গল্পটির সার্বিক সার্থকতা জাদুবাস্তবতায় রূপকতা সৃষ্টিতে। রূপকী-আশ্রয়ে *কাঠুরে* ও *দাঁড়কাক* গল্পে যেমন একনায়ক এরশাদ-সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্পটির মধ্যেও স্বাধীন বাংলাদেশের মহানায়ক শেখ মুজিবকে খুঁজে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া পার্কে জাদুখেলা দেখানো 'মোহাব্বত আলি'কে রেসকোর্স ময়দানের বঙ্গবন্ধু, খুব সুন্দরী

মায়ালোক 'প্রীতিলতা'কে স্বাধীন বাংলাদেশ, এবং জাদুকরকে হত্যাকারী 'ডুমুরখেকো'দেরকে বঙ্গবন্ধুর হন্তারকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ-প্রসঙ্গে গবেষক রবিউল করিমের বিশ্লেষণ :

> পাঠক যদি তার এই গল্পপাঠে একটু নিবিষ্ট হন তাহলেই অনুমান করতে পারবেন যে সেই রহস্যময় মানুষটি হলো আমাদের দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ মানুষকে স্বপ্ন দেখান—এই জনপদের শারীরিক, মানসিকভাবে রুগ্ন, অসুস্থ জাতির সামনে। সেই ভরাপূর্ণিমার মতো রূপসী মাইয়া মানুষটি হচ্ছে আমাদের সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ। ১১ জন মানুষের কথায় মনে হয় তার ১১ দফার কথা, যা একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চাবিকাঠি ৬ দফা। আর তিনি যে ৬টি ডুমুর থোকা বিক্রি করেন সেই ৬টি ডুমুর মানে ৬টি মৌলিক চাওয়া-পাওয়া, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা। কিন্তু কতিপয় অবিবেচক, স্বার্থপর, লোভী, হিংস্র মানুষের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয় সপরিবারে। যতদূর জানা যায় বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তখন ৫ জন তাকে ঘর থেকে বের করে আনে। আবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিবরণীতে জানা যায় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডে মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূর, মেজর মুহিউদ্দিন এবং রিসালদর মোসলেমউদ্দিন এই ৫ জন নেতৃত্ব দেয়। গল্পের শেষে দেখি যে সেই ৫ হত্যাকারী গায়েব হয়ে গেছে, তাদের বিছানায় এক খণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং সকালে তাদের অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে। আমরাও কি বলি না![২০]

অর্থাৎ, *কাঠুরে* ও *দাঁড়কাক* গল্পের মতো *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্পেও রূপক উজ্জ্বলতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর, এই রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় আপাত ব্যাখ্যাহীন ও জটিল জাদুবাস্তব-গল্প *ডুমুরখেকো মানুষ*।

রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা ও রাজনৈতিক হিংস্রতার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানিতে জাদুবাস্তব শিল্পমাধ্যমের সৃষ্টি হয়েছিলো। যার কারণে জাদুবাস্তবতায় বিভিন্ন উপাদান ও শিল্পকৌশলে রাজনৈতিক বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শহীদুল জহিরের ছোটগল্পেও এই রাজনৈতিক বিষয়টি সর্বাত্মকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর *কাঠুরে* ও *দাঁড়কাক* গল্পে একনায়ক এরশাদের স্বৈরতন্ত্র এবং *ডুমুরখেকো মানুষ* গল্পে স্বাধীনতার মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড রূপকী-আশ্রয়ে উঠে এসেছে। গল্প দুটি বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায়, শহীদুল জহির জাদুবাস্তবতাকে শুধুমাত্র আক্ষরিকভাবে ব্যবহার করেননি, বাংলাদেশের ছোটগল্পে তিনি জাদুবাস্তবতাকে প্রয়োগ করেছেন শিল্পসম্মতভাবে। রূপক ও রাজনৈতিক চেতনাকে মননে রেখে তিনি সচেতনভাবে অগ্রসর হয়েছেন জাদুবাস্তবতার জাদুময়ী আন্দোলনে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ কথাশিল্পী শহিদুল জহিরের মূল নাম মো. শহীদুল হক। পিতা : নুরুল হক, মাতা : জাহানারা খাতুন, পিতামহ : জহিরউদ্দিন। জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩। পৈতৃক বাসভবন : ৩৩১/১ নয়াটোলা, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭। স্থায়ি ঠিকানা : হাশিল, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। মৃত্যু : ২৩ মার্চ ২০০৮। শহীদুল জহিরকে 'স্বীকৃত কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী' বলবার মূল কারণ হলো, তাঁর পরে এখন পর্যন্ত আর-কেউ বাংলাদেশের কথাশিল্পে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি।

২ হাসান আজিজুল হক, 'সোনা-মোড়া কথাশিল্পী : শহীদুল জহির', *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ.২৫।

৩ রবিন পাল, 'জাদু বাস্তবতা : বাস্তবতার ভিন্ন স্বর', *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক*, সংকলন ও সম্পাদনা : হাবিব রহমান, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.২৫২।

৪ দ্রষ্টব্য : সুব্রত কুমার দাস, *বাংলা কথাসাহিত্যে যাদুবাস্তবতা এবং অন্যান্য*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১৩২।

৫ তদেব, পৃ.১৩৩।

৬ দ্রষ্টব্য : রবিন পাল, পৃ.২৬১-২৬২।

৭ দ্রষ্টব্য : 'বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শহীদুল জহিরের লেখার তথ্য', *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পৃ.৬৬৬।

৮ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬২৪।

৯ মেহেদী ধ্রুব, *শহীদুল জহিরের ছোটগল্প : বিষয় ও প্রকরণ*, স্নাতকশ্রেণির থিসিস, ২০১১, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

১০ 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক', *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, সমাবেশ, ২০০৬, ঢাকা, পৃ.৬৪।

১১ তদেব, পৃ.৭৩।

১২ তদেব, পৃ.৭৪।

১৩ তদেব, পৃ.৮১।

১৪ তদেব, পৃ.৮২।

১৫ *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পৃ.৬৬৬।

১৬ 'ডুমুরখেকো মানুষ', *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, পৃ.৮৪।

১৭ তদেব, পৃ.৯১।

১৮ তদেব, পৃ.৯২।

১৯ মামুন মুস্তফা, 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প : জাদুবাস্তবতার নিরিখে তীব্র পরাবাস্তবতার সম্মোহ চিত্র', *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পৃ.৩৬৭-৩৬৮।

২০ রবিউল করিম, 'করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন শুধু ঘুরি', *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পৃ.২৮৩-২৮৪।